বাংলাদেশ ক্রিকেটে জীবন্ত কিংবদন্তি: খালেদ মাসুদ

মো. নূর আলম

খালেদ মাসুদ, যিনি সাধারণত খালেদ মাসুদ পাইলট বা পাইলট নামে পরিচিত। একজন প্রাক্তন বাংলাদেশের জাতীয় দলের ক্রিকেটার এবং টেস্ট ও ওয়ানডে দলের সাবেক অধিনায়ক। পাইলট ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ সালে রাজশাহী জেলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন উইকেটকিপার এবং মধ্যক্রমের ব্যাটসম্যান ছিলেন। ১৯৯৫ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত তিনি জাতীয় দলের নিয়মিত সদস্য ছিলেন। বাংলাদেশি কোচ ডেভ হোয়াটমোর তাকে "এশিয়ার সেরা উইকেটকিপার" হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। ২০০৮ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর, তিনি রাজশাহী বিভাগ দলের অধিনায়ক হিসেবে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে থাকেন। ২০১১ সালে তার দলকে শিরোপা জেতানোর পর তিনি ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দেন।

তাঁর পিতা শামসুল ইসলাম ছিলেন ১৯৭০-এর দশকের একজন খ্যাতনামা বাংলাদেশি ফুটবলার। তিনি একজন স্ট্রাইকার হিসেবে কাজী সালাউদ্দিন এর সাথে জুটি গড়ে আবাহনী ক্রীড়া চক্রকে ১৯৭৭ সালে ঢাকা লীগ শিরোপা জেতাতে সাহায্য করেন। খালেদ মাসুদ ২০১৯ সালে নিউজিল্যান্ড সফরের জন্য বাংলাদেশ দলের ম্যানেজার হিসেবে নির্বাচিত হন। খালেদ মাসুদ ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলে খেলা শুরু করেন। উইকেটকিপার হওয়ার পাশাপাশি তিনি সাধারণত ৩ নম্বরে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটিং দায়িত্ব পালন করতেন। মাত্র দুই বছরের মধ্যে তিনি জাতীয় দলে জায়গা পান এবং ১৯৯৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইংল্যান্ড 'এ' দলের বিপক্ষে খেলেন। একই বছরের শেষের দিকে তিনি শারজাহতে ওয়ানডে অভিষেক করেন।

খালেদ মাসুদ এক বর্ণাঢ্য আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার পার করেন। ২০০০ সালের নভেম্বরে টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের বিপক্ষে ঐতিহাসিক ম্যাচে অভিষেকের সময় ব্যাট হাতে ৩২ এবং অপরাজিত ২১ রান করে তিনি নজর কাড়েন। তবে তার সবচেয়ে স্মরণীয় টেস্ট মুহূর্ত আসে ২০০৪ সালের মে মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে। প্রথম ইনিংসে ৬৪ রানের লিড নেওয়ার পর, বাংলাদেশ দল দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১২৩ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে ফেলে। সেসময় মাসুদ দলের হাল ধরেন এবং অপরাজিত ১০৩ রান করেন। তার সঙ্গে মোহাম্মদ রফিক এবং তাপস বৈশ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ৫ এপ্রিল ১৯৯৫ ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে ক্রিকেটে খালেদ মাসুদের অভিষেক হয়। খালেদ মাসুদ ১৯৯৭ সালের আইসিসি ট্রফিতে বিজয়ী বাংলাদেশ দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। সেখানে তিনি গড় রানসংখ্যায় দলের শীর্ষে ছিলেন। তিনি স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে সেমিফাইনালে ৭০ রান করে আমিনুল ইসলামের সঙ্গে ১১৫ রানের জুটি গড়েন এবং ম্যাচ সেরা হন। ফাইনালে তার দ্রুতগতির ১৫* রানের ইনিংস বাংলাদেশের জয় নিশ্চিত করে। ২০০৭ বিশ্বকাপের দল থেকে বাদ পড়ার পর তিনি ২০০৮ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

খালেদ মাসুদ পাইলট বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা খেলোয়ারের মধ্যে একজন। বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসে সবচেয়ে সফলতম উইকেট রক্ষক। সফল ডানহাতি ব্যাটসম্যান। ১৯৯৭ সালের আইসিসি ট্রফির ফাইনালে পাইলটের ব্যাট থেকে আসা ৬ কেনিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ জিতবে বিশেষ অবদান রেখেছে। টেস্ট ও ওয়ানডে উভয় ক্ষেত্রেই সফলতার সঙ্গে খেলেছেন এ ডানহাতি ব্যাটসম্যান। ২০০৭ সালের ২৮ শে জুন শ্রীলংকার বিপক্ষে শেষ টেস্ট এবং ২০০৬ সালের ৫ই ডিসেম্বর জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে শেষ ওয়ানডে ম্যাচ খেলেন। ক্যারিয়ারে ৪৪টি টেস্টে ১টি সেঞ্চুরি ও ৩ হাফ সেঞ্চুরিতে ১৯.০৪ ব্যাটিং গড়ে ১ হাজার ৪'শ ৯ রান করেন পাইলট। তাঁর টেস্টে সর্বোচ্চ রান ১০৩*। এই সময় তিনি স্ট্যাম্পের পিছে ৭৮ টি ক্যাচ ও ৯ টি স্ট্যাম্পিং করেন। আর ১২৬টি ওয়ানডে ম্যাচে ৭টি হাফ সেঞ্চুরিতে ২১.০৯ ব্যাটিং গড়ে ১ হাজার ৮'শ ১৮ রান করেন। এই সময় তিনি স্ট্যাম্পের পিছে ৯১ টি ক্যাচ ও ৩৫ টি স্ট্যাম্পিং করেন। ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর নিলেও কোচিংয়ের সাথে যুক্ত রয়েছেন এ তারকা ক্রিকেটার। ক্রিকেট ছাড়াও টেলিভিশনে কয়েকটি নাটকে অভিনয় করেছেন খালেদ মাসুদ পাইলট।

এই পর্যায়ে খালেদ মাসুদের ক্রীড়া জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু অজানা তথ্য তুলে ধরাযাক- ১) ক্রিকেট খেলায় ম্যান অব দ্য ম্যাচ বলতে বুঝায় একটা ম্যাচে সব খেলোয়াড়ের মাঝে সবচেয়ে ভালো খেলেছেন এমন কিছু। ম্যান অব দ্য সিরিজ বলতে বুঝায় একজন খেলোয়াড় কোনো একটি সিরিজে সবচেয়ে ভালো খেলেছেন। তবে ভালো-খারাপ যা-ই খেলুক না কেন, সচরাচর খুব এক্সট্রা অর্ডিনারি কিছু না করলে পরাজিত দল থেকে কাউকে ম্যান অব দ্য ম্যাচ অথবা ম্যান অব দ্য সিরিজের পুরস্কার দেওয়া হয় না। ম্যান অব দ্য সিরিজের পুরস্কার পাওয়া এমনিতেই খুব কঠিন কাজ। আর ছোটো দলে খেলে সেটা পাওয়া তো আরও বেশি কঠিন। বিশেষ করে ২০০০ সালের বাংলাদেশ দলের কথা চিন্তা করলে সেটা অসম্ভবের পর্যায়েই পড়ে। বাংলাদেশের পক্ষে এখন পর্যন্ত ওয়ানডেতে সবচেয়ে বেশি ম্যান অব দ্য সিরিজের পুরস্কার পেয়েছেন সাকিব আল হাসান, পাঁচবার। ইতিহাস সৃষ্টিকারী সেই বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম ম্যান অব দ্য সিরিজ হয়েছেন খালেদ মাসুদ পাইলট। **২)** শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২০০২ সালের সেই সিরিজ ছিল শ্রীলঙ্কার মাটিতেই। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাংলাদেশের পারফর্মেন্স আগে বেশ খারাপই ছিলো। সেই সিরিজটাও ভালো কাটেনি। তবে এর মাঝেও মাসুদ ব্যতিক্রম ছিলেন। সিরিজের প্রথম ম্যাচেই ৮৬ রানে ৪ উইকেট পড়ার পর তুষার ইমরানকে নিয়ে ৯০ রানের জুটি করেন। ১৭৬ রানে তুষারও তাকে ছেড়ে চলে যান। লোয়ার অর্ডারের ব্যাটসম্যানদের সঙ্গী করে শেষ পর্যন্ত ২২৬ রান

পর্যন্ত করতে পারে বাংলাদেশ, যাতে পাইলটের ৫৪ রান বড়ো অবদান রাখে। ম্যাচ অবশ্য শ্রীলঙ্কা জিতে নেয় ৫ উইকেটে। দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশের আরও জঘন্য অবস্থা হয়। মাত্র ৭৬ রানে অল আউট হয়ে যায় বাংলাদেশ। পাইলট দলীয় সর্বোচ্চ ১৫ রান করে শেষ ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হন। মাত্র ১৫ ওভারেই ২ উইকেট হারিয়ে জিতে যায় শ্রীলঙ্কা। সিরিজের ৩য় ম্যাচে শ্রীলঙ্কা প্রথমে ব্যাট করে দাঁড় করায় ২৫৮ রানের এক শক্ত স্কোর। বাংলাদেশ অল আউট হয় ২০০ রানে। এর মাঝে পাইলট করেন ৩৭ রান। সিরিজের প্রাপ্তি ছিল অধিনায়ক পাইলটের ম্যান অব দ্য সিরিজের পুরস্কার পাওয়া। এরপর আরও কতজনে কত কিছু হবে, কিন্তু প্রথমজনের তো আলাদা কিছু মর্যাদা প্রাপ্য থাকে। সিরিজের একটি ম্যাচেও নিজের দল জয় পায়নি। ব্যক্তিগতভাবে একটি ম্যাচেও ম্যান অব দ্য ম্যাচ হননি। সিরিজের সর্বোচ্চ রান করেননি কিংবা সবচেয়ে বেশি উইকেটও পাননি। এরপরেও ম্যান অব দ্য সিরিজ পাওয়ায় ভূমিকা রেখেছিল অধিনায়কত্ব আর লড়াকু মানসিকতা। এভাবে বিশ্বের আর কেউ সম্ভবত ম্যান অব দ্য সিরিজের পুরস্কার পাননি।

যেকোনো একটি দেশের জনগণের মনে খেলাধুলায় উম্মাদনা তৈরির জন্য একটি বড় ধরনের সফলতার প্রয়োজন। বাংলাদেশ ক্রিকেট দল সেই সফলতা আনতে পেরেছিল ১৯৯৭ সালের আইসিসি ট্রফি জয়ের মাধ্যমে। ফাইনাল ম্যাচের শেষ বলে যখন জয়ের জন্য বাংলাদেশের ১ বলে ১ রান প্রয়োজন ছিল, তখন উত্তেজনায় ফুটছিল বাংলাদেশের মানুষ। হাসিবুল হোসাইন শান্তর দৌড়ে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ জিতে গেলেও সেই ম্যাচ জয়ের পেছনে পাইলট রেখেছিলেন বেশ বড় ভূমিকা। একটা পর্যায়ে বাংলাদেশের প্রয়োজন ছিল শেষ ৬ বলে ১১ রান। শেষ ওভারের প্রথম বলেই ছক্কা মেরে ম্যাচটা হাতের নাগালেই নিয়ে আসেন পাইলট। শেষ পর্যন্ত অপরাজিত ছিলেন ১৫ রানে, মাত্র ৭ বলে। টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের পক্ষে সবচেয়ে বেশি ব্যাটিং গড়ে ছিলেন তিনি। সেমি ফাইনালের ম্যাচে তিন নম্বরে নেমে ৭০ রানের এক ইনিংস খেলে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হন। ক্রিকেটার হওয়াটা হয়েছিল হুট করেই। খেলাধুলার সাথে সখ্যতা ছিল পারিবারিকভাবেই। পাইলটের বাবা শামসুল ইসলাম ঢাকা লিগেই খেলেছেন ২০ বছর। পূর্ব পাকিস্তানের হয়ে সেই সময় জাতীয় দলেও সুযোগ পেয়েছিলেন। খেলার সুযোগ না পেলেও পাকিস্তানের যুব দলের হয়ে রাশিয়া সফর করেছিলেন। তাই ফুটবলই ছিল পাইলটের ভালোবাসা। কিন্তু ১৯৮৭ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপের সময় রাজশাহীর জেলখানা মাঠে মিঠু স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে রাজশাহী স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে খেলার সুযোগ পেয়ে গেলেন ক্লাস সেভেনে পড়া পাইলট। নেমে প্রথম ম্যাচেই করে ফেললেন ফিফটি। সেই টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ স্কোরারও হয়ে যান তিনি। সেই সময় শ্রীলংকার ডুমিন্ডা নামের এক বোলার ছিলেন যাকে ঢাকার কেউ খেলতে পারতেন না। তাকেও এক ম্যাচে মেরে ৯৪ রানের একটা ইনিংস খেলে ফেললেন পাইলট। ব্যাস, এরপরেই তার নাম-ডাক ছড়িয়ে পড়লো সবজায়গায়। এর পরপরই ঢাকা থেকে তার ডাক আসে। শুরুটা ওয়ারীর হয়ে হলেও পরবর্তীতে কলাবাগানের হয়ে তিন বছর খেলেন। এরপর আবাহনী-মোহামেডানের হয়েও মাঠ মাতিয়েছেন।

জাতীয় দলের হয়ে প্রথম সুযোগ মেলে অনুর্ধ্ব ১৯ এর হয়ে ১৯৯৩ সালে। পরের বছরেই সফরে আসা ইংল্যান্ড 'এ' দলের বিপক্ষে সেঞ্চুরি তাকে মূল দলে জায়গা পাইয়ে দেয়। ১৯৯৫ সালের শারজাহ কাপেই ওয়ানডেতে অভিষেক হয়ে যায়। এরপর তো বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি স্মরণীয় কাজেরই অংশ হয়ে গিয়েছিলেন পাইলট। বাংলাদেশের অভিষেক টেস্টের সময় দলের প্রয়োজনে পাইলট ঠেকিয়ে খেলছিলেন। সেই সময় টিকে থাকাটাই ছিল মূল উদ্দেশ্য, রানটা ভাবার বিষয় ছিল না। তখন সৌরভ গাঙ্গুলী এসে বললেন, "এত বিরক্তিকর ব্যাটিং কোথা থেকে শিখেছ?" উত্তরে পাইলটও কম যান না। বললেন, তোমাদের সুনীল গাভাস্কারের কাছ থেকে। তিনি তো ৬০ ওভার মাঠে টিকে ১৭৪ বল খেলে তুলেছিলেন মাত্র ৩৬ রান! মনে নেই? লড়াকু মানসিকতার পাইলট মাঠে প্রতিপক্ষকেও ছাড় দেননি। দেশের হয়ে একটি টেস্ট সেঞ্চুরিও করেছেন, সেটাও দলের খুব প্রয়োজনের সময়ে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তাদের মাঠেই সিরিজের প্রথম টেস্টে বাংলাদেশ যখন ২য় ইনিংসে ব্যাট করতে নামলো তখন লিড পেয়েছিল ৫২ রানের। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে যেন পিচটা ব্যাটসম্যানদের জন্য বধ্যভূমিতে রূপান্তরিত হলো। মাত্র ৭৯ রানেই স্বীকৃত প্রথম ৬ জন ব্যাটসম্যান সাজঘরে ফিরে যাওয়ার পর পাইলট মাঠে নামলেন। তার সেঞ্চুরিতেই বাংলাদেশ দাঁড় করালো ২৭১ রানের একটি স্কোর। সেই টেস্ট ড্র করতে পেরেছিল বাংলাদেশ।

খালেদ মাসুদ ছিলেন বাংলাদেশের দ্বিতীয় টেস্ট অধিনায়ক এবং অন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা দেশ হিসেবে প্রথম দশকে সেরা উইকেটরক্ষক। বাংলাদেশের ক্রীড়া সম্প্রদায় তাকে একজন পথপ্রদর্শক হিসেবে স্মরণ করে, যিনি তার কঠোর পরিশ্রমী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পথ দেখিয়েছিলেন। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ দলের হয়ে খেলে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে সফলতার অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যান।

#

লেখকঃ বিসিএস-তথ্য (সাধারণ), জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত

পিআইডি ফিচার